**†kvKven AvM÷ উপলক্ষ্যে বিশেষ নিবন্ধ**

**‘...আমি আবার ফিরে আসব’**

অজয় দাশগুপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবেতনভোগী কর্মীরা বেতনসহ কিছু সুবিধা বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলন শুরু করে ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে। কলিকাতা থেকে বিএ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগে ভর্তি হওয়া শেখ মুজিবুর রহমান ততদিনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করে ফেলেছেন। ছাত্রলীগ ছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশন এ আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছে। কর্মচারীদের সমর্থনে ছাত্র ধর্মঘট চলছে। ক্ষুব্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৪৯ সালের ২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানসহ ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কাউকে সরাসরি বহিষ্কার, কাউকে জরিমানা। শেখ মুজিবুর রহমানসহ কয়েকজনকে ১৫ টাকা করে জরিমানা করা হয়। বলা হয়, ১৭ এপ্রিলের মধ্যে সদাচরণের মুচলেকা দিলে ক্ষমা করা হতে পারে। বেশিরভাগ ছাত্রনেতা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে মুচলেকা দেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান মুচলেকা বা বণ্ড প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তাকে ১৯ এপ্রিল গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই নিয়ে দ্বিতীয় বার তাঁর জেল জীবন। প্রথম বার জেলে গিয়েছিলেন এক বছর আগে, ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ডাকা হরতালে পিকেটিং করার সময়।

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের জন্ম’ গ্রন্থ প্রণেতা কাজী আহমেদ কামাল, কলিকাতায় পড়াশোনার সময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বেকার হোস্টেলে ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি (বঙ্গবন্ধু) বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন, যাবার আগে তিনি বলে যান, ছাত্র হিসেবে না হলেও আমি আবার ফিরে আসব।’

কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁর কাছে হাজির হন চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী, কলিকাতায় ছাত্র আন্দোলন করার সময় যার সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। ‘সিক্রেট ডকুমেনটস অব ইন্টেলিজান্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দি ন্যাশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’-এর প্রথম খন্ডে বলা হয়েছে, ‘ফজলুল কাদের চৌধুরী ৯ মে (১৯৪৯) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের ছাত্র ও মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময়ে শেখ মুজিবকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপোশের প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। ক্ষমা চাইতেও রাজী হননি। তাঁর মতে, ছাত্ররা এমন কোনো অন্যায় করেনি যে জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। তারপরও ফজলুল কাদের চৌধুরী আপোশের জন্য পীড়াপীড়ি করলে শেখ মুজিব চারটি শর্ত উপস্থাপন করেন এভাবে– সকল ছাত্রছাত্রীর শাস্তি প্রত্যাহার, এ ঘটনায় আটক সকল ছাত্রের মুক্তি, নতুন করে কারও বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া ও সংবাদপত্রে খবর প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।

অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ না করায় তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের অবসান ঘটে। কিন্তু জীবনের যে পাঠ তিনি গ্রহণ করেছেন মাতৃভূমির প্রতি, জনগণের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা ও কর্তব্যবোধ থেকে, সেটাই তাকে সংকল্পবদ্ধ করে তোলে। তিনি শপথে অটল থাকেন, আবার ফিরে আসার সংকল্প বাস্তবায়ন হয়।

কারাগার থেকে তিনি মুক্ত হন ২৬ জুন। এর তিন দিন আগে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। গণতন্ত্র, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা, পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা, স্বায়ত্তশাসন– এ সব বিষয় গুরুত্ব পায়। অসাম্প্রদায়িক সংগঠনের ধারণাও সামনে আসে। নিরাপত্তা বন্দি থেকেও বঙ্গবন্ধু নির্বাচিত হন যুগ্মসাধারণ সম্পাদক হিসেবে। তাঁর কারামুক্তির দিনে নাজিমুদ্দিন রোডের জেল গেটে ব্যান্ড পার্টিসহ বড় মিছিল নিয়ে হাজির দলের সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। কারামুক্ত তরুণ নেতাকে মিছিল করে নেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল তখনই বলতে শুরু করেন, আওয়ামী লীগ তাঁর প্রাণপুরুষকে বরণ করে নিয়েছে।

ছাত্রত্ব নেই, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন নেই। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রয়ে গেছে তাঁর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে। ১৯৪৯ সালের শেষ দিনে তিনি ফের গ্রেফতার হন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রফিক-সালাম-বরকতের রক্তদানে যে অমর গাঁথা রচিত হয়, তখনও তিনি কারাগারে। এ মহান আন্দোলন গড়ে তোলায় তিনি অবদান রেখেছেন। সে সময়ের গোয়েন্দা রিপোর্টের বার বার উল্লেখ করা হয়েছে– চিকিৎসার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাখা হলে তিনি এ সুযোগের ‘অপব্যবহার’ করে রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে একের পর এক গোপন বৈঠক করছেন। ২১ ফেব্রুয়ারির হরতাল কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় রেখে তাঁর সিদ্ধান্ত– আমরণ অনশন শুরু করব। ভাষা আন্দোলনের সাফল্য তাঁর মুক্তির কারণ হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তিলাভ করেন তিনি। ঠিক দুই মাস পর ২৬ এপ্রিল তাঁর ওপর অর্পিত হয় ক্রমেই জনপ্রিয় হতে থাকা আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব। গোয়েন্দা প্রতিবেদন সূত্রে আমরা জানতে পারি, প্রথম ২১ ফেব্রুয়ারি পালন উপলক্ষ্যে ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে মিছিল বের হয়, তাতে নেতৃত্ব দেন শেখ মুজিবুর রহমান ও আতাউর রহমান খান।

এভাবেই তিনি ফিরে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

-২-

ষাটের দশকের শুরুতে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রবল ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার পরিকল্পনায় ছিলেন তিনি। কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ নেতাদের সঙ্গে তিনি আন্দোলনের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে পরামর্শ দেন। আন্দোলন চলাকালেই ১৯৬২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তাঁকে গ্রেফতার করে চার মাস আটক রাখা হয়। বাষট্টির এ আন্দোলনের মতোই শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে ১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি আমতলায় বক্তৃতা দিতে আসেন না; কিন্তু প্রেরণা কে সেটা আমজনতা জানে, তারচেয়েও বেশি করে জানে বাঙালির স্বার্থহানির জন্য সদা সক্রিয় পাকিস্তানের শাসক চক্র। সঙ্গত কারণেই তাঁর স্থান হয় কারাগারে।

বাঙালির স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতে উপস্থাপন করেন ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি। এ আন্দোলন নস্যাতের জন্য দায়ের করা হয় কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ফের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গর্জে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ১১-দফা দাবিতে প্রবল ছাত্র আন্দোলন। গোটা দেশের ছাত্র-জনতা সোচ্চার হয় শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে। ছিন্ন হয়ে যায় ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তিলাভের পরদিন রেসকোর্স ময়দানে ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমদের প্রস্তাবে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু হিসেবে।

এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি অনন্য উচ্চতায় ফিরে আসেন ১৯৭১ সালের ২ মার্চ। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। কলাভবন সংলগ্ন বটতলায় ডাকসু ও ছাত্রলীগের আহ্বানে ছাত্র-জনতার ঢল। সেখানে উত্তোলন করা হয় লাল-সবুজ-সোনালী রংয়ের পতাকা, যা বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রিতিনিধিদের দ্বারা স্বীকৃত হয় জাতীয় পতাকা হিসেবে। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি... যে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত– তারও আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব এসেছিল ডাকসুসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালের ৭ মে বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের সমাবেশে তাঁকে ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে বহিস্কার করে যে অন্যায় আদেশ জারি হয়েছিল, তার অনুলিপি এ দিন তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে এ বহিস্কারাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা হয় আরও অনেক পরে– ২০১০ সালের ১৪ আগস্ট। একটি গুরুতর ভুল এভাবে সংশোধন করা হয়।

১৯৭২ সালের ২০ জুলাই বঙ্গবন্ধুকে আরেক বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে হয় ছাত্র আন্দোলনের একটি বড়ো বিচ্যুতি সংশোধনে। কিছু ছাত্র পরীক্ষা না দিয়ে পাস করিয়ে দেওয়ার অন্যায় দাবিতে উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করলে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিসভার বৈঠক স্থগিত রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার ভবনে এসে উপাচার্যকে মুক্ত করেন এবং আত্মঘাতী দাবি উত্থাপনকারীদের ভৎর্সনা করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর হিসেবে এ দিন তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসার কর্মসূচি নির্ধারিত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার দায়িত্ব বিস্মৃত হয়নি। এ প্রতিষ্ঠান থেকেই জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, দেয়ালে লেখা হয়– জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু এবং এক মুজিবের রক্ত থেকে লক্ষ মুজিব জন্ম নেবে। ১৯৭৫ সালের ৪ নভেম্বর বটতলা থেকে ‘কাঁদো বাঙালি কাঁদো’ ব্যানার নিয়ে শোক মিছিল যায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের ৬৭৭ নম্বর বাসভবনে। বিকেলে সিনেট সভায় বঙ্গবন্ধু হত্যায় শোক ও ঘাতকদের বিচার দাবি করে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় সিনেটের তিন ছাত্র প্রতিনিধি ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক মাহবুবজামান এবং ছাত্রনেতা ইসমত কাদির গামা ও অজয় দাশগুপ্তের উদ্যোগে। পরদিন পালিত হয় হরতাল।

১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রথম বার্ষিকীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে আয়োজন করা হয় মিলাদ। নিষ্ঠুর সামরিক শাসনের বাধা উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে দিনভর ছাত্রছাত্রীরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

এভাবেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বার বার ফিরে আসেন তাঁর প্রাণের প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

#

০৯.০৮.২০২০ পিআইডি ফিচার